MYZ‡ši `dvidv

গোলাম মোর্তোজা ও অনিরুদ্ধ ইসলাম

কেন্দ্রে মানুষ যায় না, অথচ ভোটের বাক্স ভরে যায়। এমন চিত্র জনগণের কাছে নতুন নয়। বলা যায়, এটাই ছিল নির্বাচনের রীতি এবং নীতি। ১৯৯১ সালের আগের নির্বাচনগুলোর কথা বলছি। এ সময় থেকে গণতন্ত্র মোটামুটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। বিশ্বাসযোগ্য, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের ধারায় উত্তরণ ঘটেছে বাংলাদেশের। পরপর তিনটি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় এসেছে গণতান্ত্রিক সরকার। যদিও এর মাঝে '৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি ভোটারবিহীন নির্বাচন হয়েছিল। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এ নির্বাচনটিকেও বৈধতা দিতে হয়েছে। এ নির্বাচনটি সম্পন্ন করেছিল খালেদা জিয়ার বিএনপি। তারা ক্ষমতায় থেকে আর একটি নির্বাচন করে আলোচিত হয়েছিল। জনগণ সেই 'মাগুরা প্রহসন'-এর কথা এখনো ভুলতে পারেনি। ভোট কারচুপির সেই উৎসবের স্মৃতি মানুষের মনে আর একবার জেগে উঠলো। ১ জুলাই ঢাকা-১০ আসনে সেই উৎসবটি আবার করে দেখালো বিএনপি, জোট সরকার। বর্তমান সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দানবীয় শক্তিতে রাজত্ব করছে বিএনপি। সেই দানবীয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচনে। কিন্তু সন্ত্রাস বা বিশৃঙ্খলার কোনো চিত্র মানুষের চোখে পড়েনি। একটি 'চমৎকার ব্যবস্থাপনা'র মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে পুরো প্রক্রিয়াটি।

বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে চারদলীয় প্রার্থী মোসাদ্দেক আলী ফালুকে। হেরে গেছেন, হারিয়ে দেয়া হয়েছে বিকল্প ধারার প্রার্থী এই আসনের পদত্যাগী সাংসদ মেজর (অবঃ) আবদুল মান্নানকে।

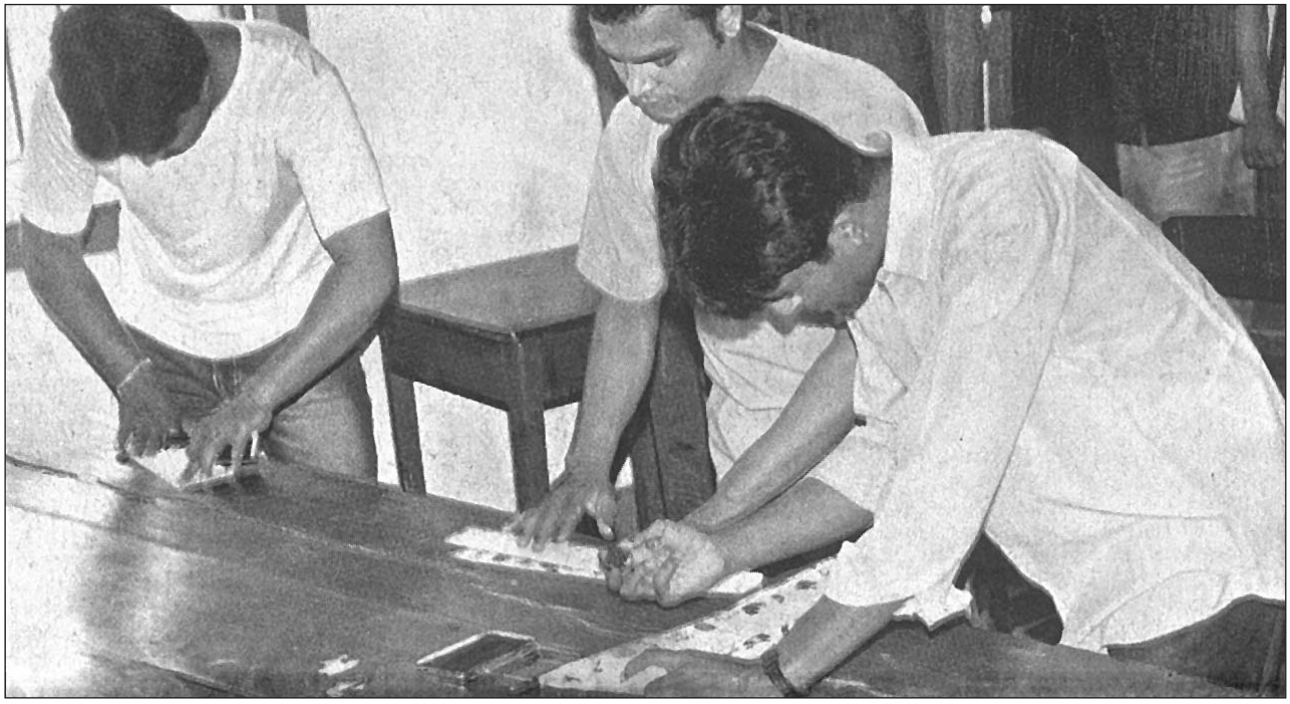

কোথাও ভোট স্থগিত হয়নি অথবা বিশেষ কোনো অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেনি। বাংলাদেশের নির্বাচনে ভোট কারচুপির অনেক ইতিহাস আছে। কিন্তু এমন পরিকল্পিত এবং একই সময় শান্তিপূর্ণ কারচুপির নজির আর কখনো দেখা যায়নি

সেই সঙ্গে হেরেছে সমস্ত নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ দেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যেটুকু অর্জন ছিল তার বারোটা বাজিয়ে দেয়া হয়েছে।

মুন্সিগঞ্জের উপনির্বাচনে বিএনপি থেকে পদত্যাগকারী সাংসদ মাহী বি. চৌধুরী বিপুল ভোটে জয়লাভ করলে ক্ষমতাসীন দল কিছুটা বেকায়দায় পড়ে যায়। কিন্তু ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচনে সরকারি দল কোনো ঝুঁকি নেয়নি। মুন্সিগঞ্জের উপনির্বাচনে তারা যে তথাকথিত নিরপেক্ষতার মুখোশ পরেছিল সেটা প্রথম থেকেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়। প্রতীক বরাদ্দ থেকে শুরু করে ভোট গ্রহণ ও ফলাফল সব ক্ষেত্রেই তারা সরকারের সর্বোচ্চ প্রভাব প্রয়োগ করে।

এই নির্বাচনটি সুষ্ঠু হবে কি না, সে বিষয়ে সর্বত্র সন্দেহ ছিল। এ কারণে বিএনপির মহাসচিব মান্নান ভুঁইয়া, এক নম্বর যুগ্ম মহাসচিব তারেক জিয়াসহ প্রথম সারির কয়েকজন নেতা নির্বাচনের আগে তিন-চার দিন একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। যা ছিল চমকপ্রদ। তারা জোর দিয়ে বলেন, নির্বাচনে সরকার কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না। সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন হবে। এ কথায় মানুষ আশাবাদী হয়েছিল নির্বাচন নিরপেক্ষ হওয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু এরপর পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সরকার বুঝে যায় নির্বাচন সুষ্ঠু হলে ফালুর পরাজয় নিশ্চিত। বিএনপির এবং সরকারের ভেতরের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশটিও চাইছিল না ফালু নির্বাচনে বিজয়ী হোক। মানুষ ভোট দিতে পারলে সেটা সম্ভব ছিলও না। তারপর ভেতরে ভেতরে ঘটতে থাকে নাটকীয় ঘটনা। পরস্পর বিরোধী পক্ষগুলো একত্রে বসতে বাধ্য হয়। বাধ্য হয় একত্র হয়ে ফালুর নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে। এতে ফালুর অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও জেতার পরিবেশ তৈরি হয় না। এই অবস্থায় চূড়ান্ত হয় কারচুপির পরিকল্পনা। যারা চাইছিলেন নির্বাচন নিরপেক্ষ হোক, তারা হাইকমান্ডের ভয়ে চুপচাপ দেখতে থাকেন কারচুপির প্রক্রিয়া। তাদের কিছু বলার থাকে না। এ অবস্থায় আবার এই নেতাদের অনেকের মধ্যে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে প্রতিযোগিতা লেগে যায়। নির্বাচনের পর সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের পক্ষের হিসেবে পরিচিত মান্নান ভুঁইয়াকেও বলতে হয়, 'নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হয়েছে।' মান্নান ভুঁইয়া দাবি করেছেন, বিকল্প ধারার প্রার্থী মেজর (অবঃ) মান্নানের এলাকায় কোনো অবস্থান নেই। তাই তিনি ভোটারদের কাছে যেতে পারেননি। প্রতি কেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট দেয়ার লোকও তার ছিল না।

মান্নান ভুঁইয়ার অভিযোগ মিথ্যা নয়। এলাকায় বিকল্প ধারা বা মান্নানের অবস্থান নেই সত্যি। কিন্তু প্রতি কেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট দেয়ার সামর্থ্য তার ছিল। তিনি সেটা দিয়েছিলেনও। বিএনপির নিখুঁত পরিকল্পনার কাছে কোনো কিছুই টিকতে পারেনি।

মান্নান ভুঁইয়ার বক্তব্য অনুযায়ী নির্বাচনে যে কারচুপি, জাল, ভুয়া ভোট হয়েছে তার প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সকাল থেকে বাস ভর্তি করে লোক এনে জড়ো করা হয়েছে বিভিন্ন স্থানে। মগবাজারের বিশাল সেন্টারের পেছনেই চার-পাঁচশ' মানুষ এনে জড়ো করা হয়। পরে তাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠানো হয় ভোট দেয়ার জন্য। ঢাকা-১০ আসনের প্রতিটি ভোটকেন্দ্র ভোটারের হাঁটা পথের দূরত্বে। সর্বোচ্চ রিকশায় যাওয়া যেতে পারে। বাসে করে ভোট দিতে যাওয়ার মতো কেন্দ্র একটিও নেই। তাহলে বাস ভর্তি করে এই মানুষগুলো আনলো কারা? মেজর মান্নানের যেহেতু এলাকায় অবস্থান নেই, তাই তার পক্ষে লোক নিয়ে আসা সম্ভব নয়। মান্নান ভুঁইয়ার কথায়ই এটা প্রমাণ হয়।

এই লোক এনেছিল ফালু, লোক এনেছিল বিএনপি।

ক্ষমতাসীন দল এই নির্বাচনী এলাকার বাইরের লোকদের জড়ো করে ভোট দেয়ার জন্য। বিএনপির সাংসদ ও বিএনপি নেতাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এসব লোক ঢাকার অন্যান্য অঞ্চল, এমনকি ঢাকার বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয় এবং তাদের প্রত্যেককে আগে থেকেই প্রস্তুত করে ভোটার স্লিপ ও সঙ্গে টাকা ধরিয়ে দেয়া হয় ভোট দেয়ার জন্য। এসব ভোটার দিয়েই সকাল থেকে ভোটকেন্দ্রে লাইন দিয়ে দেয়া হয়। কেউ যাতে চ্যালেঞ্জ করতে না পারে, তার জন্য বিরোধী দলের মূল প্রার্থী মেজর (অবঃ) মান্নানের সব এজেন্টকে কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়ে এজেন্টের জায়গা নিয়ে নেয় সরকারি দলের লোকেরা। মান্নানের এজেন্টদের বিষয়ে আগের রাত থেকেই তৎপর ছিল ফালুর লোকজন। টাকা দিয়ে অনেককে কিনে ফেলা হয়। যাদের কেনা যায় না তাদের ভয় দেখিয়ে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়। এসব করেই তারা ক্ষান্ত ছিল না, সব রকম নির্বাচনী আইন ও নিয়ম উপেক্ষা করে সরকারি দলের এই লোকেরাই ভোট বুথের সামনে প্রহরা বসায় কে আসছে বা যাচ্ছে এবং কাকে ভোট দিচ্ছে সেটা পর্যবেক্ষণের জন্য। পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে এতো দ্রুততার সঙ্গে তারা এ কাজ সম্পন্ন করে যে, বেলা ১০টার মধ্যেই এই নির্বাচনের ১০৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ৭৯টি কেন্দ্রই তাদের দখলে চলে আসে। কেন্দ্রে বিরোধী দলের প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট না থাকায় কেউ আর এসব ভোট চ্যালেঞ্জ করেনি। ফলে কোথাও ভোট স্থগিত হয়নি অথবা বিশেষ কোনো অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেনি। বাংলাদেশের নির্বাচনে ভোট কারচুপির অনেক ইতিহাস আছে। কিন্তু এমন পরিকল্পিত এবং একই সময় শান্তিপূর্ণ কারচুপির নজির আর কখনো দেখা যায়নি।

ঢাকা-১০ আসনের এই নির্বাচনী কারচুপির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রে কেন্দ্রে অবাধে জাল ভোট দেয়া। প্রথম দিকে জাল ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে রাখঢাক করার চেষ্টা হলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ রাখঢাক তুলে নিয়ে প্রকাশ্যেই জাল ভোট দেয়া হয়। এ ব্যাপারে রেকর্ড সৃষ্টি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রগুলোতে। এসব কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের সকালে নাস্তা খাইয়ে ভোট দিতে পাঠানো হয়। এসব ছাত্রছাত্রীরা একেকজন ৫০-৬০টি, কেউবা শতাধিক ভোট দিয়েছে। পরের দিকে অবশ্যই এই ছেলেমেয়েরা আর ধৈর্য রাখতে পারেনি। তারা প্রিসাইডিং অফিসার-পোলিং অফিসারের সামনেই ব্যালট বই নিয়ে তাতে ভোট দেয় এবং মুড়িতে পোলিং অফিসারদের স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করে।

শুধু জাল বা ভুয়া ভোটার নয়, ভুয়া এজেন্টও ছিল এই নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'কুলা' প্রতীকের এজেন্টদের বের করে দিয়ে তাদের জায়গায় সরকারদলীয় প্রার্থীর লোক বসিয়ে দেয়া হয়। উপনির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য প্রার্থীর এজেন্টরাও ছিল ভুয়া। নির্বাচনের ফলাফলের কেন্দ্রওয়ারি হিসাবে দেখা যায় যে, উপনির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ২২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৯ জনের প্রতীক নিয়ে এজেন্ট হিসেবে যারা ছিলেন তাদের ভোটও ঐ প্রার্থী পাননি।

বাস ভর্তি করে এই মানুষগুলো আনলো কারা? মেজর মান্নানের যেহেতু এলাকায় অবস্থান নেই, তাই তার পক্ষে লোক নিয়ে আসা সম্ভব নয়। মান্নান ভুঁইয়ার কথায়ই এটা প্রমাণ হয়। এই লোক এনেছিল ফালু, লোক এনেছিল বিএনপি

সাধারণত প্রার্থীর বা তার দলের বিশ্বস্ত ব্যক্তিরাই পোলিং এজেন্ট হন এবং সাধারণভাবে ঐ পোলিং এজেন্ট ঐ কেন্দ্রেরই ভোটার হন। কিন্তু এবারের উপনির্বাচনে সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঐ পোলিং এজেন্টদের ভোটের হিসাবে পাওয়া যায়নি। উপনির্বাচনের ১০৩টি কেন্দ্রে ৫৮৭টি ভোট বুথের ৫০০টিতেই এসব প্রার্থীর এজেন্ট ছিল। কিন্তু তারা ভোট পেয়েছে ১০০-রও কম। সাংবাদিক ও নির্বাচনী পর্যবেক্ষকরা যেসব বুথে গেছেন তার অধিকাংশতে এসব প্রতীকের ৫ থেকে ১০ জন পোলিং এজেন্ট ছিল। এদের ভোট পেলেই এসব প্রতীকে ৩০০ থেকে ৫০০ ভোট পড়ার কথা। কিন্তু সেই হিসাব কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

এই চমকপ্রদ কারচুপির নির্বাচনের বিষয়ে চমকপ্রদ বক্তব্য রেখেছেন, প্রধানমন্ত্রীর আর এক রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী। প্রকাশ্যে জাল ভোট দেয়ার ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি বলেছেন, 'ছবি সব সময় সত্যি কথা বলে না। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেকভাবে ছবি বানানো যায়।' কী অসাধারণ বক্তব্য! আওয়ামী লীগ যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় তখন ঠিক এ রকম বক্তব্য একবার রেখেছিলেন জিল্লুর রহমান। ডা. ইকবালের মিছিল থেকে গুলি করে ৪ জনকে হত্যা করা হয়েছিল। পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল সেই ছবি। আওয়ামী লীগ সেই ছবিকে বলেছিলো বানানো। আবদুল গাফফার চৌধুরী 'ক্যামেরা ট্রিকস' বলে নিজেকে হাস্যকরভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। বিরোধী দলের বিএনপি তখন ছবির পক্ষে কথা বলেছিল। এখন আওয়ামী লীগ যেভাবে বলছে। এই হলো বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের চরিত্র!

হারিছ চৌধুরীদের কথায় অবাক হওয়াটাই বোকামি!

তবে আমাদের রাজনীতিবিদ হারিছ চৌধুরীদের একটি প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে। মাননীয় হারিছ চৌধুরী আপনি যেহেতু মনে করেছেন পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি বানানো, তাহলে যারা ছবিটি তৈরি করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন। এর জন্য শুরুতে প্রমাণ করতে হবে ছবিটি সত্যি নয়, বানানো। দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তারা যদি রায় দেয় ছবিটি বানানো তাহলে, সংশ্লিষ্ট ফটো সাংবাদিক, সম্পাদক এবং পত্রিকার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া যাবে। এ রকম একবার করলে আর কেউ ছবি বানাতে সাহস করবে না। এই প্রস্তাবটি কি গ্রহণ করবেন হারিছ চৌধুরী? নিশ্চয়তা দিচ্ছি সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে সব রকমের সাহায্য করা হবে। কিন্তু তারপরও এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না হারিছ চৌধুরী। কারণ ছবি যে বানানো নয়, সেটা তিনি খুব ভালো করে জানেন। এও জানেন, যে ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, ঘটনা এর চেয়ে প্রকাশ্যে আরো ভয়াবহভাবে ঘটেছে। হারিছ চৌধুরী এও জানেন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ভোট কারচুপি করা যায়, সত্য ছবিকে অসত্য বানানো যায় না। রাজনীতিবিদরা অবশ্য কথা দিয়ে সবই করতে পারেন!

ঢাকা উপনির্বাচনে ভোটের যখন এই অবস্থা তখন নির্বাচনী ব্যবস্থাতেই ছিল চরম ত্রুটি। নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হয়েছিল, ঢাকার প্রতিটি কেন্দ্রকেই তারা ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেন এবং সে হিসেবে পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী প্রতি কেন্দ্রে নিয়োগ করবেন। এজন্য নির্বাচন কমিশন থেকে প্রতি কেন্দ্রে সেনা মোতায়েনের জন্য সরকারের কাছে চিঠি দেয়া হয়। আর নির্বাচন কমিশনের চাওয়া এই সেনা মোতায়েনের প্রশ্ন নিয়েই চলে বিরাট প্রশাসনিক ও আইনি লড়াই। নির্বাচন কমিশন প্রতি কেন্দ্রে সেনা মোতায়েনের কথা বললেও নির্বাচন কমিশনের সচিব প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে কমিশনের এই চিঠি পাঠাতে টালবাহানা করতে থাকে। পরে সংবাদপত্রে বিষয়টি প্রকাশিত হলে ঐ চিঠি পাঠানো হয়। এবার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে নির্বাচন কমিশনকে কোনো জবাব দেয়া হয় না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধীদলীয় প্রার্থী বিকল্প ধারার মেজর (অবঃ) মান্নান এ ব্যাপারে কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী সেনা মোতায়েনের জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ চেয়ে রিট আবেদন করেন। হাইকোর্ট বিষয়টি এই বলে নিস্পত্তি করেন যে, সরকারের পক্ষ থেকে ঐ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার সময় রয়েছে। এবং সরকার যদি নির্বাচন কমিশনের কথা না শোনে তাহলে পুনরায় আদালতের দ্বারস্থ হলে তারা বিষয়টি দেখবেন।

হাইকোর্টের ইঙ্গিতের প্রতি সম্মান দেখানোর প্রয়োজন মনে করেনি সরকার। মেজর (অবঃ) মান্নানসহ চারজন প্রার্থী সরকারের প্রতি সেনা মোতায়েনের নির্দেশ দাবি করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট নির্বাচন কমিশনের চাহিদা অনুসারে প্রতি কেন্দ্রে সেনা মোতায়েনের জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র সচিব নির্বাচন কমিশনকে জানান, প্রতি কেন্দ্রে ৫ জন করে সেনা মোতায়েন করা হবে। কিন্তু নির্বাচনের দিন দেখা যায় অধিকাংশ কেন্দ্রেই সে অনুযায়ী কোনো সেনা মোতায়েন করা হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেনা সদস্যদের রাস্তায় টহল দিতে দেখা গেছে, তাও কেন্দ্র থেকে বহু দূরে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিজেই এ ঘটনা স্বীকার করে বলেছেন যে, কেন্দ্রে সেনা মোতায়েন না করায় হাইকোর্টের আদেশ লঙ্ঘিত হয়েছে। অপরদিকে দায়িত্বরত সেনা সদস্যরা জানিয়েছে, কেন্দ্রে প্রহরা দেয়ার কোনো নির্দেশ তাদের ছিল না। তবে কোনো কোনো কেন্দ্রে সেনা মোতায়েন দেখা গেছে। সম্ভবত এসব উদাহরণ দেখিয়েই প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী বিবিসিকে বলেছেন, হাইকোর্টের আদেশ মান্য করে সেনা মোতায়েনের প্রমাণ তাদের কাছে রয়েছে।

ঢাকা-১০ উপনির্বাচনে সবচেয়ে অসহায় ছিল নির্বাচন কমিশন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আইনকানুন প্রয়োগ করতে সচেষ্ট থাকলেও খোদ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ই অসহযোগিতা করে। নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসাররাও সরকারি দলীয় প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। সমস্ত সংবাদপত্র ও পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনে জাল ভোট ও ব্যাপক অনিয়মের কথা উল্লেখ করলেও নির্বাচনী এই অফিসাররা বলেছেন, সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। তারা নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ফলে নির্বাচন কমিশনের করার কিছুই ছিল না। আর প্রধান নির্বাচন কমিশনার আগেই পালিয়ে বেঁচেছেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার এমনিতেই জনতার মঞ্চের আসামি। তার অন্য দুই সহযোগীও সরকারের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছেন। ফলে নির্বাচন বাতিল বা স্থগিত করার কোনো সাহস দেখায়নি নির্বাচন কমিশন।

ঢাকা-১০ আসনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ অন্য বিরোধী দলগুলো সাপোর্ট দিয়েছিল মান্নানকে। নির্বাচনের দু'তিনদিন আগে মাঠেও নেমেছিল আওয়ামী লীগ। এর ফলে মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয়েছে মেজর (অবঃ) মান্নানের। মজার ব্যাপার হলো, নির্বাচনের দিন আওয়ামী লীগের কোনো নেতা-কর্মীকে এলাকায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। হিসাব বুঝে নিয়ে মান্নানকে একা ফেলে কেটে পড়েছেন সবাই। আর ফালু তার ইচ্ছে মতো বাস্তবায়ন করেছেন পরিকল্পনা। শেখ হাসিনা কারচুপির অভিযোগ করে চলে গেছেন বিদেশে। যদিও এটা তার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি।

মেজর (অবঃ) মান্নানকে পরাজিত করার জন্য ফালু, বিএনপি যা করা প্রয়োজন সবই করেছে! আওয়ামী লীগও চায়নি বিজয়ী হোক মেজর মান্নান। মেজর মান্নান বিজয়ী হলে লাভ হতো বিকল্প ধারার, আওয়ামী লীগের নয়। সেটা বুঝেই আওয়ামী লীগ চেয়েছে মান্নানের পরাজয়। মাঠ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। আওয়ামী লীগ কারচুপিকে ইস্যু করতে চেয়েছে। কিছুটা করেছেও। সরকার বিষয়টি বুঝতে পেরেও কারচুপি করেছে।

খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার কাছে নিজের 'ইগো' সবচেয়ে বড় ব্যাপার, দেশ বা দল নয়। খালেদা জিয়া যেভাবে মেজর মান্নানকে পরাজিত করলেন, শেখ হাসিনাও ক্ষমতায় থেকে একইভাবে পরাজিত করেছিলেন কাদের সিদ্দিকীকে। সেদিনও পর্যবেক্ষক, পত্র-পত্রিকা কারচুপির চিত্র তুলে ধরেছিল। সেটাকে গুরুত্ব দেননি শেখ হাসিনা। এখন যেভাবে দিচ্ছেন না খালেদা জিয়া। এই দল দুটির হাতে দেয়া হয়েছে গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব। যারা নিজেরা সামান্যতম গণতন্ত্রের বিশ্বাস করেন না। হাইকোর্ট, সংসদ কোনো কিছুই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ শুধু নিজের স্বার্থ।

বি. চৌধুরী এখন শুধু ভালো ভালো কথা বলেন। কিন্তু তিনি যখন বিএনপিতে ছিলেন তখন মাগুরার নির্বাচন নিয়ে কোনো কথা বলেননি। না, কথা বলেছিলেন। কারচুপির নির্বাচনকে সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ বলেছিলেন। মানুষ যে কাকে বিশ্বাস করবে, আর কাকে অবিশ্বাস করবে না সেটাও বুঝতে পারছে না!

নির্বাচন পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছে যে কয়টি প্রতিষ্ঠান, তারা সবাই বলেছেন, নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হয়নি। অবাধে কারচুপি হয়েছে। প্রিসাইডিং অফিসার থেকে শুরু করে সবাই কারচুপিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অফিসাররা সিল মেরে ব্যালট বাক্সে ঢুকিয়েছেন।

ভোট কারচুপির এই চিত্র ছিল প্রায় সবক'টি কেন্দ্রে। তারপরও ক্ষমতার দাম্ভিকতা দেখিয়ে সরকার বলেছে, নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হয়েছে। ফালু বিজয়ী হয়েছেন। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে, ফালু শপথ নিয়েছেন।

একটি নির্বাচন, একজন ফালুর বিজয়ের জন্য প্রশ্নের মুখে পড়েছে গণতন্ত্র। দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন, সন্দেহ। আমরা আবার কি পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করলাম? আমরা আবার কী '৯১ সালের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাচ্ছি? এ কারণেই কী পরিকল্পিতভাবে দফারফা করা হলো গণতন্ত্রের? এ দেশের মানুষ তো অনেক মূল্য দিয়েছে। দু-একজন মানুষের জন্য তাদের আর কত মূল্য দিতে হবে?

খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার কাছে নিজের 'ইগো' সবচেয়ে বড় ব্যাপার, দেশ বা দল নয়। খালেদা জিয়া যেভাবে মেজর মান্নানকে পরাজিত করলেন, শেখ হাসিনাও ক্ষমতায় থেকে একইভাবে পরাজিত করেছিলেন কাদের সিদ্দিকীকে